যুগান্তর

তারিখ : 29 AUG 2012
পৃষ্ঠা : ৫ কলাম : ৬

কাজী ফারুক আহমেদ

এমপিওর জন্য কান্না

এবার ঈদ উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের মুঠোফোনে শুভ বার্তা যেমন পেয়েছি, অনেকে আবার মুঠোফোনে কথাও বলেছেন। তবে ঈদের তিনদিন আগে ও দু'দিন পরে দুই কলেজ শিক্ষকের মুঠোফোনে আহাজারি ছিল মর্মস্পর্শী। দু'জনই যশোরের দুটি বেসরকারি কলেজের এমপিওবঞ্চিত তৃতীয় শিক্ষক। মোবাইল ফোনে দেখার সুযোগ নেই কিন্তু তাদের কান্নার শব্দ শুনতে ভুল হয়নি। আবেগে কান্নায় তাদের কণ্ঠরোধ হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল।

এ কান্নার একটা পটভূমি আছে। আগে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 'জনবল কাঠামো' অনুযায়ী ডিগ্রি কলেজে ডিগ্রি ক্লাসের প্রতি বিষয়ে দু'জন এবং ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের জন্য একজন হিসাব করে তিনজনকে এমপিওভুক্ত করা হতো। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এ ব্যবস্থা রহিত করে ডিগ্রি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি মিলে প্রতি বিষয়ে দু'জন শিক্ষকের এমপিও দেয়ার বিধান চালু করা হয়। এর ফলে আগে ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রির জন্য আলাদাভাবে যে তিন শিক্ষকের এমপিওর বিধান ছিল তা একজনের ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায়। এ শিক্ষকরাই ডিগ্রি কলেজের এমপিওবঞ্চিত তৃতীয় শিক্ষক। সারাদেশে ডিগ্রি কলেজগুলোতে এ ধরনের তৃতীয় শিক্ষক কয়েক হাজার। যারা বছরের পর বছর শিক্ষক হিসেবে পাঠদান করে গেলেও এমপিও থেকে বঞ্চিত। যশোরের দুই শিক্ষকও আছেন এদের মধ্যে। উল্লেখ্য, জোট সরকারের সময় এ সমস্যার সূত্রপাত হলেও সে সময় অষ্টম জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৯তম বৈঠকে বেসরকারি ডিগ্রি কলেজে তৃতীয় শিক্ষক এমপিওভুক্তির বিষয় জরুরি ভিত্তিতে পরিপত্র জারির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়। তদনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের তৎকালীন মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ ২২ মে ২০০৬ শিক্ষা সচিবের কাছে 'অতি জরুরি সংসদ অগ্রাধিকার' সিলযুক্ত পত্র পাঠান। কিন্তু পত্র পাঠানোই সার। বর্তমান মহাজোট সরকারের সময় শিক্ষাবিষয়ক সংসদীয় কমিটির প্রস্তাব ও শিক্ষক সংগঠনগুলোর লাগাতার কর্মসূচির ফলশ্রুতিতে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বন্ধকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও প্রদান পুনরায় চালু করে দেড় হাজারের বেশি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় শিক্ষকদের এমপিও বঞ্চনার অবসান হয়নি। রাশেদ খান মেননের সভাপতিত্বে শিক্ষাবিষয়ক সংসদীয় কমিটি একাধিক সভায় সুনির্দিষ্টভাবে তৃতীয় শিক্ষকদের এমপিওর সপক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিক পত্র দিয়েছে। কিন্তু অনেক অনুরোধের পরও তৃতীয় শিক্ষকদের ভাগ্য যে তিমিরে ছিল, এখনও সে তিমিরে। কর্মরত কিন্তু এমপিওবঞ্চিত এসব শিক্ষকের দুর্দশার সাক্ষী আরও অনেকে। এর মধ্যে আছেন সরকার নির্ধারিত যোগ্যতার সব শর্ত পূরণ করেও এমপিওবঞ্চিত থাকা ৭ হাজারের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী। তাদেরও সরকার থেকে বেতনের ব্যবস্থা নেই। পদোন্নতি, বাসা ভাড়া, চিকিৎসা সুবিধা, উৎসব ভাতা কোনটাই নেই। তারপরও আশায় বুক বেঁধে তারা এমপিওর জন্য বছরের পর বছর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন।

লেখার শুরুতে এবারের ঈদের আগে-পরে এমপিওবঞ্চিত দু'জন তৃতীয় শিক্ষকের কান্নার কথা উল্লেখ করেছি। পরিবার পরিজন নিয়ে ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যে ঈদ করতে না পারায় তাদের যে মর্মবেদনা ও আহাজারি, তা যে কোন সংবেদনশীল মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে বাধ্য। এ এক মানবিক ট্র্যাজেডি। আমাকে তা বিশেষভাবে স্পর্শ করার একটা বড় কারণ তাদের কথায় শুধু দুঃখ ও বঞ্চনা বোধ নয়, যুক্তি ছিল। যেমন সরকার তৃতীয় শিক্ষকদের এমপিও দেবে কী দেবে না, বলে দিলেই পারে। এমপিওর জন্য অপেক্ষমাণেরা, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যোগ্যতার শর্ত পূরণকারীরা কে কবে এমপিও পাবে অথবা আদৌ পাবে কি-না সরকারের দিক থেকে অবস্থান স্পষ্ট করতে বাধা কোথায়? তাহলে যারা বছরের পর বছর ধারদেনা করে একরকম না খেয়ে অথবা অর্ধাহারে থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করছে তারা তা না করে অন্য পেশায় চলে যেত। এখন তাদের অনেকেরই অন্য পেশায় যাওয়ার বয়স পেরিয়ে গেছে।

এমপিওভুক্ত অথবা এমপিওবঞ্চিত উভয় ক্ষেত্রেই বেসরকারি শিক্ষকরা পদোন্নতি, প্রবৃদ্ধি, আবাসন সুবিধা অথবা বাসা ভাড়া, পরিবার-পরিজন নিয়ে ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যে ধর্মীয়-সামাজিক উৎসব পালন— সব ক্ষেত্রেই বঞ্চিত। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও অপ্রাপ্তি স্তূপীকৃত হয়ে হিমালয়সম মানবিক সমস্যার জট তৈরি করেছে। এর ওপর 'বোঝার উপর শাকের আঁটি' হিসেবে আছে তথ্য পরিসংখ্যানের অসম্পূর্ণতা ও ঘাটতি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যানবেইস বা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর মাউশি কারও কাছেই এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বাইরে কত প্রতিষ্ঠান আছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে কতজন শিক্ষক বা কর্মচারী কর্মরত, তার সঠিক তথ্য নেই। এদিক থেকে মাউশি অবশ্য কিছুটা এগিয়ে। কারণ এমপিওর জন্য আবেদনকারীরা মাউশিতেই আবেদন জমা দেয়। তাদের মধ্যে কতজন বা কত প্রতিষ্ঠান এমপিওপ্রাপ্তির যোগ্য সে সম্বন্ধে তাদের একটা ধারণা থাকে। তবে তাও পূর্ণাঙ্গ নয়। অথচ এমপিওর আওতায় নেই এমন প্রতিষ্ঠান ও সেখানে কর্মরতদের তথ্য-পরিসংখ্যান থাকাটা কোন অংশে কম জরুরি নয়। এ সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য। এমপিওভুক্ত, এমপিওবহির্ভূত প্রতিষ্ঠানের তথ্য না জানলে শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ থেকে শুরু করে জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কোনটাই যথাযথভাবে হতে পারে না। এসবের জরিপ হওয়া দরকার।

যারা শিক্ষার উন্নয়নকে যুক্ত করে বাংলাদেশে শিক্ষক আন্দোলনে নতুন ধারা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী, তাদের দিক থেকে প্রায় এক দশক ধরে কোন্ এলাকায় কয়টি প্রতিষ্ঠান, কোন্ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন তা নিরূপণে নির্ভরযোগ্য জরিপের কথা বলা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ তথা হালনাগাদ তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত হতে ব্যানবেইসকে শক্তিশালী করার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোন মহলের উদ্যোগ বা তৎপরতা চোখে পড়েনি। এ বছর সংসদে প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ দিয়ে সরকার শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রত্যাশা পূরণে কতটা কী করতে পারে, বিভিন্ন সংগঠন থেকে বিশেষ করে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট তা লিখিতভাবে ও মুখে বহুবার বলার পরও সরকার থেকে কোন ফিডব্যাক পাওয়া যায়নি।

শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কলেজ জীবন থেকে। শিক্ষক আন্দোলনেও চার দশকের বেশি সময় পার করে দিয়েছি। এসব নিয়ে যখন ভাবি, একটি বিষয় তীব্র মনোকষ্ট দেয়। তা হল প্রত্যেক সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা। কিন্তু এসব তো বিচার বিশ্লেষণের ব্যাপার। শার্শা কলেজ অথবা যশোর মহিলা কলেজের এমপিওবঞ্চিত শিক্ষকের তাতে কী হবে? তাদের ভবিষ্যৎ কী? নিজেকে নিজে যখন এ প্রশ্ন করি উত্তর খুঁজে পাই না। কিন্তু বঞ্চিত শিক্ষকের আহাজারি তো তাতে থামে না।

জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৩ অনুচ্ছেদের ৩ ধারায় আছে : 'কর্মরত প্রতিটি মানুষের কাজের ন্যায্য ও সন্তোষজনক পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার আছে, যা পরিবার পরিজন নিয়ে সম্মান ও মানবিক মর্যাদার সঙ্গে তার জীবন যাপন নিশ্চিত করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রয়োজনমতো অন্যবিধ সামাজিক সুরক্ষা।' মানবাধিকার ঘোষণার ২৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে : 'প্রত্যেকেরই যুক্তিসঙ্গত শ্রম ঘণ্টার সীমারেখা ও প্রচলিত নিয়মে বেতন-ভাতাসহ বিশ্রাম ও অবকাশ ভোগের অধিকার আছে।' এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের তৃতীয় শিক্ষক, এমপিওবঞ্চিত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা আজ এ দুটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রয়েছেন। এ আন্দোলন তাদের মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে এ বিশ্বাস আমার আছে। এ আস্থাও আছে যে, তাদের অর্জনের মধ্য দিয়ে জীবনের গানে প্রাণ সঞ্চারিত হবে। গতিময়তার ঢেউ তাদের পেশাগত জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : প্রবীণ শিক্ষক নেতা
principalqfahmed@yahoo.com